



Vol. 55 | No. 2 | 2018



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বেহলা-পুরাণ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের কবিতা

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nepa Zahan
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.8
Pages	১৫২-১৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বেহুলা-পুরাণ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের কবিতা

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ : লোকনায়িকা বেহুলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে দিয়ে বাঙালি পাঠকের মনোরঞ্চিতকে তৃপ্ত করেছেন বহুকালব্যাপী। বাংলা কাব্যসম্ভারে এই নারী পুরাণের শৃঙ্খল ভেদ করে বিনির্মিতও হয়েছেন শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে। এই পরিক্রমায় ৪৭-পরবর্তী কবিতায় এর উপস্থিতি ক্রমাগত বেড়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কবিতায় বেহুলা-পুরাণের ব্যাপক প্রয়োগ পাঠক-গবেষকের পৃথক মনোনিবেশের দাবিদার। ঐতিহ্যিক সূত্রেও বাংলাদেশের কবিতা অবশ্য এই প্রয়োগের পক্ষে। বেহুলা-চরিত্রের পৌরাণিক উৎস সন্ধান করে বাংলাদেশের কবিতায় এর বিচিত্রমাত্রিক প্রাসঙ্গিকতা ও নির্মিতির স্বরূপ উন্মোচন বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ক.

বেহুলার বাসরঘর বাংলাদেশের উত্তর জনপদে এখনো প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। তাই লোকপুরাণের বেহুলা-কথার প্রভাব এই ভূখণ্ডের কবির কল্পনায় জাগরুক থেকে চিন্তনের বিবিধ মাত্রাকে স্পর্শ করে বিনির্মিত হবে এমনটাই স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বেহুলা-পুরাণের প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রবন্ধের অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম নারীচরিত্র বেহুলা। বিষ্ণুপুরাণ মতে দৈত্যরাজ বাণের কন্যা তিনি এবং শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র তথা প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষা। পুরাণে তাঁকে পার্বতীর শাপভ্রষ্টা পারিপার্শ্বিকা বলা হয়েছে। লোককাহিনি মতে বেহুলা উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা এবং চম্পকনগরের চন্দ্রধর সওদাগরের কনিষ্ঠপুত্র লখিন্দরের স্ত্রী। লোকপুরাণের এই বেহুলাই বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত ও উদ্ধৃত। ‘বাস্তব দৃষ্টিতে মনসামঙ্গলের বেহুলা পৌরাণিক সাবিত্রীর অনুসরণ। কিন্তু মনসামঙ্গলের কবিদের, বিশেষ করে বিজয়গুপ্তের কল্পনায় সে প্রতীকধর্মী এক বিশিষ্টতা’ (ক্ষেত্রগুপ্ত : ২০০১ : ১৩৮)। কবি-কল্পনায় বেহুলা তাঁর রূপ, সংকল্প, জেদ ও বিদ্রোহ নিয়েই কেবল হাজির হননি, প্রায়শই হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র বেহুলা মোটিফও। পুনরাবৃত্তভাবে এই মোটিফের উপস্থিতি ঘটেছে কখনো কাব্যে, কখনো কাব্যাংশে।

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

খ.

মূল আলোচনায় প্রবেশের প্রস্তাবনা হিসেবে বেহুলা-পুরাণের কুলজী অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অধুনা তাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে মোটের ওপর একমত যে, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-কথিত যৌথ অবচেতন (কালেকটিভ আনকনশাসনেস)-এর ভেতরই মিথ-পুরাণের প্রাথমিক আদল লুকিয়ে থাকে। ইতিহাসের দিকসংকেত এবং পরিবর্তনশীল যুগচেতনার রূপটিও পুরাণ ধারণ করে। উত্তর-আধুনিক এই সময়পর্বে উত্তর-কাঠামোবাদী তাত্ত্বিক ক্লড লেভি স্ত্রাউসের মিথ বিষয়ক বক্তৃতা, গবেষণায় এই তত্ত্বের বিস্তৃত রূপ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতো সাহিত্যও গ্রহণ করেছে। বেহুলা-কাহিনিকে ‘মিথ’ না বলে বর্তমান প্রবন্ধে বলা হচ্ছে ‘পুরাণ’। কেননা—

মিথ শব্দের উৎসে রয়েছে গ্রীক ‘muthos’ শব্দ যার অনুষ্ণে বোঝা যায় যে এই ব্যাপারটি বস্তুতপক্ষে ছিল মৌখিকভাবে প্রচলিত কিছু কাহিনী, যা আদিকাল থেকে মানুষের সমাজে ক্রমবিবর্তিত রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। মিথের আদিরূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতাকল্পনা এবং বিচিত্র ধরনের সংস্কার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে, আর উত্তরকালের কবি শিল্পীরা সেই উপকরণগুলিকে চয়ন বর্জন করে নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারার লব্ধফল যে-সব ধ্যানধারণা তার সঙ্গে মানানসই করেই নতুন নতুন-কাহিনী সৃষ্টি করেন। পুরাণ মূলত ধর্মীয় অনুষ্ণটিকে উত্তরকাল পর্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রাখে। মিথ তার বাইরের আবরণ পাল্টাতে পাল্টাতে চলে এলেও, পুরাণের বহিরঙ্গটি কিন্তু মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাই পুরাণ নিয়ে যখন পরবর্তী প্রজন্ম চর্চা করতে থাকে, তখন সেখানে সমান্তরাল দুটি মাত্রা উদ্ঘাটিত হয় : একটির চালিকাশক্তি ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস, আর অন্যটি ধর্মীয় আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের ইঙ্গিতকেই সূচিত করে এবং / অথবা নিজের কালকে প্রতিবিম্বিত করে সমাজমানস অথবা ব্যক্তিমানসের অনুধ্যানে। (সেনগুপ্ত : ২০০১ : ১-২)

তাছাড়া বৈদিক সাহিত্য-সংজ্ঞায়নে পুরাণ ও ইতিহাসকে সমার্থক বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে ইতিহাস, আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সমন্বিত করে যে মিশ্ররূপসম্পন্ন গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তাদেরকেই পুরাণ বলা হয়। (সেনগুপ্ত : ২০০১ : ৫)। মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলার আখ্যান এ হিসেবেই পুরাণ। বেহুলা-কথাকে কেবল পুরাণ নয়, বলা হচ্ছে লোকপুরাণ। লোক-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Folk. নৃতাত্ত্বিক অভিধানে বলা হয়েছে—Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition. (International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore Vol-1: Copenhagen : 1960 : 126)। ‘পুরাণ ঐতিহ্যের মৌলিক ভাণ্ডারের ভাগীদার সাধারণ মানুষ বা লোক বেহুলা-পুরাণ প্রসঙ্গে বাংলারই সহজ-সাধারণ জনগোষ্ঠী। লোকপুরাণের মধ্যে পুনর্জন্মের শক্তি আছে বলেই জোসেফ ক্যাম্পবেল লোকপুরাণকে আখ্যায়িত করেছেন ‘গণস্বপ্ন’ অভিধায়। (Campbell : 1988 : 13)।

‘লোকপুরাণের প্রতি বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর (লোক এর) বিশ্বাসের প্রধান কারণ হলো, অধিকাংশ লোকপুরাণই রচিত হয় দেব-দেবী কিংবা আলৌকিক অতিথাকৃত চরিত্র বা কাহিনী অবলম্বনে।’ (ঘোষ : ২০১২ : ৭১)। লোককথা, প্রত্নস্মৃতি নিয়ে বেহুলা-কাহিনীর যে বাহ্যকাঠামো দৃশ্যমান – এর গভীরে রয়েছে নিগূঢ় ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বয়ন। মনসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা হিসেবে এ কাব্যের সার্বিক বিশ্লেষণ-বিবেচনা বেহুলা-প্রসঙ্গ সম্পর্কিত তা বলা বাহুল্য।

খ : ১

মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ প্রাচীনতম। ‘সমাজ-ইতিহাসের আদিযুগের স্মৃতিবহ’ হিসেবে চিহ্নিত করে অরবিন্দ পোদ্দার এই কাব্যে প্রতিফলিত পুরাণকথার উৎস সন্ধানপূর্বক বলেন –

...সমাজ সংগঠন যেখানে একান্তই দুর্বল এবং সমাজের মানস জীবনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করেনি, এমনি কালে এবং সমাজে নিসর্গ পূজার প্রচলন এবং দীর্ঘকাল চলে আসা সম্ভব। বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, – যেখানে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সর্পাঘাতের আশঙ্কা বর্তমান, সেখানে সেই বিশেষ নিসর্গ পূজার প্রসার একান্তই স্বাভাবিক (পোদ্দার : ১৯৯৯ : ৮২)

হুমায়ুন কবিরও তাঁর *বাংলার কাব্য*-এ বাংলাদেশে (তাঁর ভাষ্যে পূর্ববাংলা) ভৌগোলিক কারণে মনসাপূজার প্রসারের কথা বলেছেন। তবে তাঁর এ বিষয়ক রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুসন্ধানও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এক্ষেত্রে মুসলিম প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলতে চান। তাঁর মতে পশ্চিম বাংলার হিন্দুমানসে ইসলামের সংঘাতে জেগেছিল বৈষ্ণব সাহিত্য, আর পূর্ব বাংলার হিন্দুমানসে জাগল মনসামঙ্গল। এ দুটি কাব্যধারার অভিযান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বৈষ্ণব কাব্য – মানবধর্মকে অতিক্রম করে অতিমানবের ক্ষেত্রে; মনসামঙ্গল কাব্য – লোকাতীতকে সমাজ জীবনের সহজ সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশ। বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে পার্থক্যবিচার করে তিনি নিঃসন্দেহ হন সে, লৌকিক কাহিনী হিসেবেই মনসামঙ্গল কাব্যের সার্থকতা। তাঁর ভাষায়–

পূর্ব-বাঙলার নদ-নদীবহুল নিসর্গ, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির প্রাধান্য অথবা বেহুলার অভিযান, – এ সমস্ত প্রসঙ্গের আধিতৌতিক তাৎপর্য কেবলমাত্র কষ্টকল্পনা, কিন্তু নদীমাতৃক বাণিজ্যনির্ভর সমৃদ্ধ নরনারীর হিংসা ও প্রেম, তেজ ও সাহস এবং বিপুল অধ্যাবসায়ের কাহিনী হিসেবে তাদের মূল্য অপরিমেয়। বরিশালে মনসামঙ্গলের প্রথম কবি বিজয়গুপ্তের জন্ম তাই আকস্মিক নয়। ধর্মকে উপলক্ষ করে সামাজিক সম্বন্ধের এ কাব্যপ্রকাশ নানা কারণে পূর্ব বাঙলাতেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। (কবির : ২০১৫ : ১৯)

আহমদ শরীফসহ অনেক পণ্ডিত কবিরের এই বিশ্লেষণাত্মক অভিমত সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছেন। যে কারণে মনসা পূজা কিংবা মনসামঙ্গল কাব্যের অধিক প্রসার এই বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার প্রেক্ষাপট বলা যেতে পারে আমূল

বদলেছে। কিন্তু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এই ভূখণ্ডের কবিদের মজ্জাগত। আর কবি-কল্পনার অশেষ অন্বেষণ-অভীক্ষা অবিরাম যে কাব্যোপকরণ খোঁজে ভাবনার সঙ্গে ভাষার যোগাযোগ নির্মাণে, বেহুলাপুরাণ তাঁদের এই অন্বেষণেই খোরাক দিয়েছে, দিয়ে যাচ্ছে।

গ.

প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে বেহুলা-পুরাণ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই উক্ত কিংবা বিনির্মিত হয়েছে। এই প্রয়োগ সরাসরি বেহুলার নামে, কখনো বেনামে বা অনুষঙ্গ-আশ্রয়ী হয়ে প্রকাশিত; কখনো বা মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সওদাগর, লখিন্দর, মনসা প্রভৃতির নাম-প্রসঙ্গের সূত্রে উল্লেখিত বা নির্মিত আকারে প্রকাশিত। যেমন, উপন্যাসে – দীনেশচন্দ্র সেনের *বেহুলা*, অমিয়ভূষণ মজুমদারের *চাঁদবেনে*, সেলিনা হোসেনের *চাঁদবেনে*; গল্পে জাকির তালুকদারের ‘বেহুলার দ্বিতীয় বাসর’; নাটকে – মনুথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’, শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদবণিকের পালা’; কাব্য-কবিতায় – মমতা ঘোষের *বেহুলা*; কালিদাস রায়ের *চন্দ্রধর*; খোন্দকার আশরাফ হোসেনের *On Behula's Raft*; অরুণ মিত্রের ও *বেহুলা* কাজী নাসির মামুনের *লখিন্দরের গান* প্রভৃতি। এটি সর্বজন বিদিত যে মানসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্ত, যার নিবাস বাংলাদেশের বরিশালে। এ ক্ষেত্রে কাকতালীয় রূপসী বাংলার কবি এবং আধুনিক কাব্যধারায় হৃদয়স্পর্শীভাবে বেহুলার বিনির্মাণকারী বরিশালে জন্ম নেয়া জীবনানন্দ দাশ। বস্তুত বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতিতে বেহুলা-কথা ও বেহুলা-পুরাণের অনুষঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবির ‘বাংলার মুখ আমি’ কবিতাটিকে এ প্রসঙ্গে অপর এক দৃষ্টান্ত ভাবা যেতে পারে। এই কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতিকে দেখেছেন সর্বপ্রাণবাদের আলোকে। কবিতার ধরনে এটি সনেট। এর অষ্টকে ভাবের নিবর্তন ঘটিয়েছেন বেহুলার চোখে বাংলার প্রকৃতি এবং বেহুলাকে এই প্রকৃতির বাইনারি ধারণ-বিষয়ক চিত্রকল্পাত্মক বিনির্মাণে –

বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে –

কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় –

সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বখ বট দেখেছিল, হায়,

শ্যামার নরম গান শুনেছিল – একদিন অমরায় গিয়ে –

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

(জীবনানন্দ দাশ : *বাংলার মুখ আমি*)

ছিন্ন খঞ্জনার অসহায়ত্ব আর সনাতন সমাজে বিধবার অসহায়ত্ব এখানে এক-সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতার তুষ্টি অর্জনে বেহুলার মন ও শরীরের ভাষা বাংলার প্রকৃতি অনুভব করেছিল, আর তাই তারা ঘুঙুর হয়ে বাজেনি, কেঁদেছিল।

তাৎপর্যে ও বৈচিত্র্য-ব্যাপকতায় বাংলাদেশের কবিতায় বেহুলা-পুরাণ লক্ষ্যযোগ্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এরই রূপ ও ভাবের ব্যবচ্ছেদ।

ঘ.

বাংলাদেশের কবিতায় বেহুলা-পুরাণ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে জাতীয় জীবনের নানা চড়াই উৎরাইয়ের রূপায়ণে রূপকী বা প্রতীকী অনুষ্ণ হয়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী নারীকল্প বেহুলা বাংলাদেশী বাঙালির জন্ম-ইতিহাসের কাব্যরূপে পুনরাবৃত্ত একটি প্রসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গের চিত্রায়ণে কবি দ্বারস্থ হয়েছেন বেহুলা-পুরাণের –

কখনো নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে,
মনে হয় ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই।
দিন দুপুরেই জীপে একজন তরুণকে কানামাছি করে
নিয়ে যায় ওরা;
মনে হয় চোখ বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।
বেয়নেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে;
মনে হয় স্বাধীনতা-লখিন্দর যেন,
বেহুলা-বিহীন
জলেরই ভেলায় ভাসমান।
(শামসুর রাহমান : সন্ত্রাসবন্দী বুলেটবিদ্ধ দিন-রাত্রি)

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যে কবির অনুভবপুঞ্জ এখানে ভাষা পেয়েছে। দুইভাবে এই কাব্যংশের ব্যাখ্যা করা যায়, এক. ‘বেহুলা বিহীন’ মানে নেতৃত্বহীন। পাকিস্তানে কারাবন্দী বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারী বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকা এবং তাঁর অবস্থান সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় বাঙালির মনে যুদ্ধে জয়ী হওয়া প্রসঙ্গে সংশয়ের প্রকাশ। আর দুই ‘বেহুলা-বিহীন লখিন্দর’ মানে আশাহীন, করুণযাত্রী। যুদ্ধবন্দী মানুষ অগাধ নিরাশায় নিমজ্জিত। স্বাধীনতা লখিন্দরের বেঁচে ওঠার পৌরাণিক ঘটনার মতোই তাদের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শী, নিরস্ত্র বাঙালির কাছে আশার খোরাক আর কী-বা! তাদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন স্বরূপ যথার্থভাবে রূপ পায় ‘লখিন্দর যেন/বেহুলা-বিহীন/ জলেরই ভেলায় ভাসমান’-এর রূপকে। অপর এক কবির কবিতাংশ –

তোমরা ভুলে যেতে পারো আমি আজো ভুলিনি
দিনকে রাত রাতকে দিন করার সেই যে একদা
মানুষের লাশের মান্দাসে নিরদেশে চলেছে বেহুলা –
সমস্ত নদীর দুধ জল পাল্টে গিয়ে সিঁদুর লাল হওয়া
সমুদ্রের রাগে ফুঁসে ফণী ডাঙায় উঠে আসা

স্রোত মাঝে মাঝে উজানে বওয়া

লখিন্দরের পুনর্জন্ম।

(ওমর আলী : আমি ভুলিনি)

এই কাব্যংশেও বেহুলার চলার দুটি অর্থ করা যায়। প্রথমত, দেশ-মাতৃকা। মানুষের লাশের মান্দাসে নিরুদ্দেশ চলেছিল মূলত বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ত, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে মানুষের লাশ মাড়িয়ে, শত বাধা বিপত্তির মুখে নত না হওয়া সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাগণ বেহুলা-প্রতীকে যথার্থভাবেই রূপ পান। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আর লখিন্দরের পুনর্জন্ম এখানে এক হয়ে গেছে।

ঘ : ১

স্বাধীনতা লাভের আনন্দ ও তাৎপর্য জাতির কাছে অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল জাতির পিতা সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হবার দৃশ্যপটে। কবি এই ঘটনাকে রূপায়িত করতেও বেহুলা পুরাণের নানা অনুষ্ঙ্গ গ্রহণ করেন। যেমন –

এক. কী ঘুম ঘুমিয়েছিলে কালপূর্ণিমার রাতে কালের বেহুলা!

ভেসে যায় হ্রদের পানিতে দ্যাখো সোনার সংসার

যায় যায় পুত্র পুত্রবধূ, যায় ভেসে গুণের দেবর

কলার মান্দাসে ভাসো তুমি আর সোয়ামি তোমার।

(খোন্দকার আশরাফ হোসেন : কাল পূর্ণিমা)

দুই. বিবিধ বিপত্তি শেষে লখিন্দর ঠাই পেলো লোহার বাসরে,

দেখলাম, নির্দেশনা দিয়ে গেল রাজপথে বিজয় মিছিল।

লোহার বাসর ঘরে তবু থেকে যায় সূচাত্ম গোপন পথ,

তবু চিরকাল বেহুলার ভাগ্যে নামে বঞ্চনা, অপার ক্ষতি।

(রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : সাধারণের নিয়মনীতি)

তিন. মিছিলের মধ্যে থাকে কিছু কিছু গোপন মনসা –

সময় সুযোগ মতো বেহুলার লোহার বাসরে

টুকে পড়ে কালনাগ জলপাই রঙের শরীর,

লখিন্দর-আন্দোলন নীল হয় বিষের ছোবলে।

বেহুলার ভেলা ভাসে মানুষের নিভৃত ভাষায় –

(রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে)

চার. কেউ তো বোঝেনি তাকে। বলেছে সবাই, পিতাহীন

জাতির মতন শীত, রক্তশূন্য দেয়ালে পড়েছে

তার স্মৃতি, ভাসমান লাশের মতন চিরদিন

সে বেহুলা-লখিন্দর সেজে, হায়, বৃথাই সরেছে

ঘাট থেকে ঘাটে, আসলে জানে নি কিছু এ রঙিন

বৃদ্ধ, ঘরশুদ্ধ পরিজন নিয়ে নিবিড়ে মরেছে।

(বায়তুল্লাহ কাদেরী : শীত : সাত)

উদ্ধৃতি এক-এ ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট রাতের করুণ পটভূমিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে বেহুলার রূপকে ধারণ করে কাব্য সাজিয়েছেন কবি। পুত্র, পুত্রবধূ, দেবরসহ অপরাপর স্বজন নিয়ে মৃত্যুর দেশে পাড়ি জমানো এই মহিযসী সহসাই কবিকল্পে বেহুলা-প্রতিম হয়ে ওঠেন এক কাল রাতে স্বামীর মৃত্যু-সহযাত্রী হিসেবে। উদ্ধৃতি দুই-এ বিবিধ বিপত্তি শেষে লখিন্দরের লোহার বাসরে ঠাঁই হওয়া আর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দী হওয়ার ঘটনা সমান্তরাল রূপকে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নির্দেশনায় মিছিল ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ ও বাঙালির মুক্তিলাভ ঘটেছে। এরপরও বেহুলার ভাগ্য বিপর্যয় আর বাংলাদেশের ভাগ্য বিপর্যয় যথাক্রমে লখিন্দরের মৃত্যু ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরই ঘটেছিল। এই কবিতায় এরই প্রকাশ ঘটেছে। উদ্ধৃতি তিন-এ স্বজাতির ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতায় নিহত জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডকে মিছিলের গোপন মনসার ছোবল বলে রূপায়িত করেছেন কবি। জলপাই রঙের শরীরের কালনাগ সামরিক ষড়যন্ত্রীগণের প্রতীক এখানে, ‘বিষের নীল হওয়া লখিন্দর-আন্দোলন’ জনতাকে জ্বরভাবে দমিয়ে দেবার রূপকার্থে, আর সামরিক বিধি-নিষেধে ভয়াবহ মানুষের বাকরুদ্ধ চিন্তা, আবেগ-অনুভূতির যথার্থ প্রকাশ মানুষের নিভৃত ভাষাসমেত বেহুলার ভাসান। উদ্ধৃতি চার-এ রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে থেকেও নিরাপত্তাবলয়হীন শেখ মুজিবের স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস, আত্মবিসর্জন, বর্ণিল জীবনের হঠাৎ পরিসমাপ্তিতে জাতির অভিভাবকশূন্য হওয়ার কাব্যিক প্রকাশ। যে রাতে সম্পন্ন হয়েছে তাকে নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত আয়োজন, সেদিনও তিনি বিশেষ কিছু জানেননি। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে যে জড়তা ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল শীতের প্রতীকে তা এই কবিতায় এসেছে। বেহুলা-লখিন্দরের যাত্রার মতো দুঃসাধ্য যে যাত্রা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে ছিল এই দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কবি তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনপূর্বক হাহাকারের রূপায়ণ করেছেন এ-কবিতাংশে।

ঘ : ২

প্রতিনিয়ত মাতৃভূমির ওপর আসতে থাকা আঘাত বিপর্যয়ে বেহুলা-পুরাণ সাহস ও প্রেরণার আধার হয়ে ওঠে কবির কাছে। তাই দেশ রক্ষার্থে দেশপ্রেমিক কবির সতর্কতা বেহুলার নিদ্রাহীন জেগে থাকার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে পড়ে। আবার বেহুলার সামান্য নিদ্রাভাবের সুযোগে কালসাপ বাসরে ঢুকে যাওয়ার পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গ জাতীয় জীবনের গুরুতর কর্মযজ্ঞে সুযোগ-সন্ধানী কুটিল চক্রান্তকারীর অনুপ্রবেশের সঙ্গে প্রতিতুলিত। কবির ভাষায় –

বেহুলার বাসরের ফোকর গলিয়ে

লিকলিকে কালসাপ, সুচতুর, কুটিল সন্ধানী,

দূকে পড়ে প্রতিটি অন্দরে, বিবাহিত বিছানায়,
উৎপাদিত সন্তান-সন্ততি বিষেণীল রক্তবীজ;
(মোহাম্মদ রফিক : খোলা কবিতা)

এখানে বেহুলা-পুরাণের স্পষ্ট বিনির্মাণ করেছেন কবি। চেতনাহীন একটি জাতির প্রজন্মের স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন ‘বিষেণীল রক্তবীজ’ শব্দবন্ধে। আপাত-নিস্তরঙ্গ জাতিকে ধ্বংস করে দেবার নীরব চক্রান্ত কাব্যবদ্ধ হয় নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয়ে –

এই ফাঁকে বেহুলার বাসর গলিয়ে
ফণা তোলে কালসাপ নিদ্রার গহ্বরে
(মোহাম্মদ রফিক : কপিলা)

ঙ.

ঔপনিবেশিক শোষণ, উগ্র সংগ্রহবাদী পুঁজিবাদ ও এর জাঁতাকলে নিষ্পেষিত ব্যক্তি ও সমষ্টির ইতিহাস বেহুলা-পুরাণের নানা অনুষঙ্গের সাহায্যে কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। যেমন –

প্রাচীন বারমাসীর সমস্ত ময়ূরপঙ্খী আর
ভাসবে না দেশের প্রাচীন বেনোজলে
মদীনা গোনাই কিংবা বেহুলার মুখ অন্ধকার ...
বেদখল হয়ে যাচ্ছে সব বাদ্যযন্ত্র, গানের আসর
(ওমর আলী : ধীরে ধীরে সব বেদখল হয়ে যাচ্ছে প্রভু)

ঔপনিবেশিক আত্মসনে এখানকার ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিলীন হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত এখানে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার ঔপনিবেশিক পুঁজি আহরণের আত্মসী জাল ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় কীভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার মন্ত্র দেয় তার প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত পঙক্তিমালায় –

প্রতারক ঈশ্বরের প্রতিভূরা আমাদের কেড়ে নেয় দিন,
এখন চিকন সাপ আমাদের চাই, শোন, লোহার বাসর
রক্তহীন, ঘুমায় বেহুলা নারী, পাশে তার একক নাগর,
স্বার্থপর নতুন পৃথিবী তারা কালপ্রাতে সাজাবে রঙিন –
(একচেটিয়ার যুগে ভালোবাসা সেও নাকি পুঁজির খাতক)
তোমাকে হতে হবে চন্দ্রবণিকপুত্রের অমোঘ ঘাতক।
(খোন্দকার আশরাফ হোসেন : সাপ)

মনসার ভাষ্যে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে লখিন্দর-হস্তারক ‘চিকন সাপ’ অন্বেষণ, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অধিকার থেকে চতুর স্বার্থান্বেষীর উন্নতির পস্থা খোঁজার নামান্তর। মনসার কৌশল আর পুঁজিপতিদের বা তাদের দোসরদের কৌশল এখানে

অভিন্ন। আবার বৈরী এক স্থান ও কালে বেহুলাকে উদাত্ত আহ্বান জানান আরেক কবি -

ওড়ে আকাশে শকুন। উত্তর দিগন্ত ঘিরে কালো মেঘ আসে।
কেউ নেই বেহুলা নেই স্বপ্নবান কোনো এক তরুণ বেদেনি?
স্বজন-রক্তের কাছে, স্বজন হাড়ের কাছে দায়বদ্ধ, ঋণী?
কেউ কি বেহুলা নেই হাড়ের খোয়াব নিয়ে বৈরী জলে ভাসে?
(রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : ১৩, মানুষের মানচিত্র)

-‘শকুন’ ঔপনিবেশিক শোষকের প্রতীকতা নিয়ে ব্যবহৃত বহুপ্রযুক্ত একটি শব্দ। বেহুলার সাহস, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধস্পৃহার আহ্বান এই কবির রাষ্ট্রকে পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাহুমুক্ত করার প্রয়াসে। বস্তুত কবি-কল্পনার বেহুলা-পুরাণ এভাবেই নির্মিত-পুনর্নির্মিত হয়েছে সময়ের দাবিতে।

চ.

বাংলাদেশের কবিতায় বেহুলা-পুরাণের অন্যবিধ প্রয়োগ ঘটেছে রতিকেন্দ্রিক প্রেম তথা লিবিডোতত্ত্বের আলোকে -

বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো
আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো,
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।
কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে,
কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।
মৃত্যুর পিঞ্জির ভেঙে প্রাণ পাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্শা দেখে নত হোক প্রাণহারী যম,
(আল মাহমুদ : ৮, সোনালী কাবিন)

সমকালীন জীবনযন্ত্রণা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে লখিন্দররূপী কবি বেহুলার শরীরী সংশ্রব প্রার্থনা করেছেন এখানে। বাহ্য-প্রতিবেশের কুটিলতা থেকে মুক্তিকামী কবির আশ্রয় তথা জীবনীসুখা এখানে বেহুলার প্রবল বাহু-বন্ধন। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় -

ঘুম নেই, ঘুম গেছে নিন্দের বাড়িতে
যেখানে সহস্র জ্বলে মৃদু ঝাড়লঠনের আলো
আজ সারারাত তার মাজা ধরে নাচবে বেহুলা।
(খোন্দকার আশরাফ হোসেন : অনিদ্রার গান)

বেহুলার বাসররাতের নিদ্রাহীনতার লক্ষ্যকে কবি আত্মীকৃত আকারে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন এখানে। অপর এক কবির কবিতাংশ –

কিছুতে পারি না আর, কিছুতে কিছুতে
তাকে ছুঁতে;
কবিতা আমার তুই
বালিকা আমার,
যে তুই জানিস খুব ভালো করে
এই দক্ষ শরীরের সদর-অন্দর;
এখন জেনে নে তবে
বেহুলার লোহার বাসরে
আমি সাপে কাটা লখিন্দর।
(সৈয়দ শামসুল হক : কিছুতে পারি না আর)

অবদমিত-লিবিডো চেতনাকে প্রকাশার্থে কবি দ্বারস্থ হয়েছেন বেহুলা-পুরাণের। সিগমন্ড ফ্রয়েড সাপের প্রতীকতায় তাঁর তত্ত্বে কামনা-বহিঃপ্রকাশক যে সূত্রের কথা বলেছেন, সর্পদংশিত লখিন্দরের সমান্তরালে কবি তাকেই নির্মাণ করেছেন। একই প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে নিম্নোক্ত কবিতায়ও –

কী সাপে দংশিলো লখা! জীবন আন্ধার হলো, অঙ্গ হলো কালি,
এ কোন সাপের বিষ জীবন নেয় না শুধু শরীর জ্বালায়,
পরান পোড়িয়ে নামে বিষের নহর যেন রক্তের নালায়
(রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : ১৩, মানুষের মানচিত্র)

অপর এক কবিতায়–

কদম্বতলের এই
গ্রাম্যনর, কামমোহিতম রতিটানে
করে বেপরোয়া মোরে
অতঃপর চলিলুং আমি অর্ণববিহীন
সমুদ্রের জলে, এ নর করন্ত মোরে
অন্তহীন প্রগল্ভ যতিচিহ্নময় ছেদে-বিচ্ছেদে প্রগাঢ়,
তোমারে কহন্ত কত মা মনসা, গ্রাম্য
এ নরের বংশী মোরে করেছে নাগিনী।
(বায়তুল্লাহ কাদেরী : তোমারে কহন্ত কত)

উদ্ধৃত কাব্যংশে ‘কামমোহিতম রতিটানে’ ও ‘অর্ণববিহীন সমুদ্রের জলে’-এর বক্তব্যকে আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে স্পষ্ট করে তোলে। এখানে দ্বৈত-পুরাণ অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ও বেহুলা-পুরাণের জটিল অন্বয় সাধিত হয়েছে।

চ : ১

কেবল রতিবাহিত প্রেম নয়, রোমান্টিকতা-সজ্জাত প্রেম বয়নেও বেহুলা পুরাণের উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য। এ ধরনের কবিতায় কখনো প্রকৃতি আবার কখনো বাঙালির প্রেমদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়েছে। যেমন –

এক. গ্রাম্য এ লোকজ বর্ষা কলার ভেলায় চড়ে দেখি
কোথায় চলেছে ভেসে, পাশে তার শায়িত পুরুষ
বৃষ্টির ফোঁটার মতো ভগ্নপ্রায়, বাসনার তুষ
শুধু এক জ্বলছে বর্ষার মনে : এই লেখালেখি
কলম থামিয়ে দেবে মেঘ এসে, বলবে ঘরের
মধ্যে বন্দী তুমি, যতো পারো গড়ো লোহার বাসর
সূচীভেদ্য অঙ্ককারে, একদিন তোমার হাশর
তোমাকে দেখিয়ে দেবো বৃষ্টিময় প্রলাপে, জ্বরের।
(বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : বর্ষা : চার)

দুই. নয় নারী নয় নর,
যে বেহুলা সেই তো লখীন্দর,
স্বর্গ-মর্ত্যে দেহঘরি সদর-অন্দর।
শিবলোকে ইন্দ্রলোকে যুগলাঙ্গ নটনটী,
আমরা ত্রিলোকের প্রেমিক প্রেমিকা,
আমরা ত্রিলোকের প্রেমিক প্রেমিকা;
না-মনসা না বণিকশ্রেষ্ঠ
আমরা দুই জন্মশত্রুর দুই মগ্নশিখা।...
বেনে আমি, নেতা আমি, আমার প্রজাতির নাম বং
এই মরলোকে আমি পূজো করি মানব অহং।
(মুহম্মদ নূরুল হুদা : বেহুলার শাড়ি)

উদ্ধৃতি এক-এ বর্ষা ও বেহুলা কবির কাছে অভিন্ন। কবি, বর্ষা ও বেহুলা (অনুজ্ঞা, কিন্তু প্রতীত)-এই ত্রয়ী অনুষঙ্গে এই কবিতা লোক থেকে আলোকের দিকে ধাবিত। শৈশবগন্ধী আবহ-নির্মাণ ক্রমশ দৈব-নির্দেশ প্রলাপের গহ্বরে হারিয়ে যেতে থাকে। এই সত্য রোম্যান্টিক কবি-মন তীব্রভাবে অনুভব করে যে, কল্পনা, কাব্য-রচনা বা নিরাপদ বলয়ের বাইরে অবশ্যম্ভাবী হলো জীবনের অবসান। আর জ্বরের ঘোরে

প্রলাপে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্ধৃতি দুই-এ জাতিসত্তার কবি বাঙালির প্রাণপ্রবাহে যে অদ্বৈতবাদ সতত বিকশিত, তাকে রোম্যান্টিক মনের আবেগ-উচ্ছ্বাসে ধরেছেন। রাধা আর কৃষ্ণ যেমন এক, বেহুলা ও লখিন্দরও তেমনি এক। নর মূলত নারায়ণের অংশ। তাই জগৎব্যাপী এক সম্পর্ক বা প্রেমেরই বহুধা-বিভক্তি, বিচিত্র প্রকাশ। বৈষ্ণব কবি যেমন বলেন ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’, তেমনি জাতিসত্তার কবিও এই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করেন ‘পূজো করি মানব অহং’-এ।

ছ.

বেহুলা-পুরাণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব, জীবন ও মৃত্যুর সহাবস্থানের নিগূঢ় ভাষ্য এতে নিহিত। নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য, বিবিক্তি, মূল্যবোধের ভাঙন, আধুনিক জীবন সংকট, ব্যক্তির অবসাদ, সংঘজীবনের অবসান এবং এ বিষয়ক সমস্যার রূপায়ণে বেহুলা-পুরাণ স্বরূপে কখনো, আবার কখনো এসেছে বিনির্মিতরূপে। যেমন –

লাশ হয়ে যাই লোহার বাসর ঘরে,
পাশে নাগরিক বেহুলা রয়েছে শোয়া।
(রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : খুটিনাটি খুনশুটি)

নাগরিক জীবনে ব্যক্তির যে আত্মমগ্নতা সেখানে প্রতিপার্শ্ব তাৎপর্যহীন। তাই পুরাণের যে বেহুলা লখিন্দরের পাহারায় নিদ্রাহীন, নাগরিক সেই বেহুলা নির্বিকার দংশিত স্বামীর পাশে শায়িত। আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা উক্ত পঙ্ক্তিদ্বয়ে তীব্রতা নিয়ে হাজির হয়েছে। আধুনিক শহর জীবনে যেমন বিচ্ছিন্নতা এসেছে, গ্রামজীবনে তেমনি শ্লথ ও দুর্লভ হয়ে উঠেছে সংঘবদ্ধতা। তাই কবি লেখেন –

শুয়ে আছি নিদ্রা ভুলে কে আছে ভাসাবে ভেলা গাঙের জলে? আমার
পড়শীরা যদি হতো আপন- ভেঙে পড়তো মন্ত্রপড়া চুল। নিরাপদে
কেটে যেতো লোহার বাসর।
(মুজিব ইরম : পড়শী-১)

বেহুলার জবানিতে ফুটে উঠেছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে মহাবিপদ উত্তরণের সম্ভাব্যতা। পৌরাণিক বেহুলার এই মনোভাবের কথা জানা না গেলেও অনাত্মীয় পরিবেশে প্রতিনিয়ত আপন মানুষ খুঁজে ফেরা নর-নারীর এই বোধ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কাছাকাছি বিষয়ের আরেকটি কবিতা –

এত বড় এই দেশ, এত নদী এত নাও ভেলা।
তোমার জন্যে তো নেই কোনো নদী, নেই কোনো ভেলা।
এত ভালোবাসা বাদ্য, এত ধুম, বিবাহ উৎসব।
বেহুলাও নেই, বন্ধু, একা ভাসে লখিন্দর শব।
(সৈয়দ শামসুল হক : লখিন্দর)

নিঃসঙ্গ লখিন্দরের ভাষ্যে এই কবিতাতেও প্রকট হয়ে উঠেছে আধুনিক মানুষের জীবন সংকট। চারদিকে জীবনের অটেল আয়োজনে ব্যক্তি-মানুষ বিচ্ছিন্ন থেকে বিচ্ছিন্নতর হচ্ছে, শেকড় থেকে ছিটকে পড়ছে। তাই পুরাণে লখিন্দরের পাশে বেহুলা থাকলেও, শেকড়হীন আধুনিক লখিন্দর বন্ধু-পরিজনহীন চরম একা। এই ব্যক্তি-নৈঃসঙ্গ্যকে ভয়াল-দর্শনের সঙ্গে জুড়ে উপস্থাপন করেন আরেক কবি –

দুকে যাচ্ছে নিশ্চিদ্র একেকটি ঘরে ভয়াল-দর্শন
লখিন্দর-অরি কালনাগিনীর বিভিন্ন প্রজাতি!
এ যুগে বেহুলা নেই, ঘরে-ঘরে শুধু লখিন্দর
(রফিক আজাদ : যতুগৃহ)

মৃতের সহযাত্রী হয়ে যে বেহুলার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, কর্পোরেট সংস্কৃতি সেই বেহুলাকে চেনে না। সেবা, আশ্রয়, ত্যাগ সবই অর্থে কেনা-বেচা হয় পুঁজিবাদী বিশ্ববাজারে। তাই এ কবিতাংশে প্রতিটি কাতর, অসহায় মানুষের প্রতিভূ লখিন্দর; আর সেবাদায়িনী বেহুলা অন্তর্হিতা।

জ.

বেহুলা নারী। প্রাচ্যে নারী একাধারে রূপ, প্রেম, আশ্রয় ও শক্তির প্রতীক। পুরাণের বেহুলা তাই কবির প্রেমিকা বা অভীক্ষিত নারীর রূপের আদল গ্রহণ করেছেন এ-কবিতায়। বেহুলার দুর্ভাগ্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল তার রূপ-সুখমা। সে কথাই কবি স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর প্রেমিকাকে –

আমি মনে মনে মেয়েটির নাম দিই যমুনা। যদিও মেয়েটির রং কালো।
ভাবি আমার সামনে কৃষ্ণমাধবের প্রেমিকা রাধা।
ও বাঙালিনী রাধা, ও যমুনা, ঐ চোখ দু'টি কোথায় পেলে?
লোহার বাসরে বেহুলার ঢুলু ঢুলু আঁখি তারা এমন তোমার।
(আল মাহমুদ : বিপাশার চোখ)

ছোটগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে গল্পতাত্ত্বিকগণ ‘চাবুক-হানা সমাপ্তি’ (ভুইসপার্ক এন্ডিং)-এর কথা বলেন। এই কবিতাটিতেও ঠিক তা-ই আছে। ললাট অর্থ ভাগ্য বা সৌভাগ্য হলেও বেহুলার ললাট মানে দুর্ভাগ্য-ই। বেহুলার ঢুলু ঢুলু আঁখি সৌন্দর্যের বদলে এখানে তার দুর্ভাগ্যের পটভূমি নির্মাতার ভূমিকায়। বেহুলার রূপ কেবল নেতি-প্রেক্ষাপটেই কবিতায় আসেনি, এসেছে পূর্ণযৌবন ও রূপচ্ছটাসহও –

জলে চৌকাঠে বসে জল নাড়ে যুবতী রমণী।
পাতা ঝরে, জল পড়ে, টুপটাপ, হৃদয়ের একূল ওকূল
ভেসে যায় সজনী গো; ইতস্তত ভাসে
বেনোজলে বেহুলার অবিনাশী শরীরী সংরাগ।
(খোন্দকার আশরাফ হোসেন : সিঁড়িতে পায়ের শব্দ)

এ-কাব্যংশে বেহুলার রূপ ও ইতঃস্তত ভঙ্গিমার কল্পনায় ভাষারূপ পেয়েছে কবির আকাঙ্ক্ষিত যুবতী রমণী। বেহুলাকে পাশে পেলে ভরসা পান আরেক লখিন্দররূপী কবি। তাঁর কাছে প্রেরণাদায়িনীরূপে প্রতিভাত হন বেহুলা -

কিসের এমন প্রেরণা পেয়েছে মন
নষ্ট আঁধারে শ্রেষ্ঠ বাসনা খোঁজে
বুকের অসুখে সুখের স্বপ্ন লিখে
ঘন দুর্যোগে -
তবু সে ভাসায় বেহুলার সাম্পান...
তোমাকে পাবার প্রস্তুতি বাড়ে বোধে।
(রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : ১৩, মানুষের মানচিত্র)

বৈরী সময়ে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বাস্তবিক পক্ষেই বেহুলা দিতে পারেন। তাঁর শক্তির উৎস-বিন্দু তাঁর সাহস, জেদ তথা এক লক্ষ্যাভিমুখী সংকল্প। ভারতবর্ষে আদ্যাশক্তি-বিবেচিত নারীকল্প বেহুলা চরিত্রেও ধৃত বেহুলা প্রাণের ধারক-বাহক বা সৃষ্টিকারী নন, তিনি প্রাণের পুনর্জীবন-প্রত্যাশী এক লড়াকু। কবির ভাষায় -

বেহুলার আকুল রোদন সন্তানের জন্য নয়,
বিধবা জা-দের মৃত স্বামীদের পণ্য নয়
দেবসভা যার নৃত্যের নৃপুর ছন্দে মেতে ওঠে যৌবন নেশায়
তা আরতীও নয়, পূজা নয় শুদ্ধ অভিনয়।
নারীর জেদের কাছে দেবতার গাঢ় অভিশাপ
খাটো হয়ে যায়।
(আসাদ চৌধুরী : নারীর জেদের কাছে)

ঝা.

কবির চিন্তা ও কল্পনার অজস্র পেলব-কঠিন স্তরকে বেহুলা স্পর্শ করেছেন ব্যক্তি-অনুভবে, সামষ্টিকবোধে। লোকপুরাণের এই নারী স্ব-ইচ্ছা ও সংকল্পের বাস্তবায়নে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন; একা পথে চলবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; মৃতের সঙ্গে সহাবস্থানের সাহস দেখিয়েছেন; দেবসভায় নৃত্য ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন; প্রবল পরাক্রমশালী চাঁদ সওদাগর পুত্রের মৃত্যুতে বা সপ্তডিঙার সলিল সমাধিতেও যিনি ‘চেঙমুড়ীকানী’ মনসার পূজা দেননি, তার কাছে নত হননি, সেই চাঁদকে কৌশল, অশ্রু আর স্নেহধারায় সিক্ত করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন তথা বহুর কল্যাণ আনয়ন করেছেন। তাঁর এই কল্যাণী রূপ পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর সক্রিয় ভূমিকাকে যেমন স্পষ্ট করে, স্বাধীন মানুষ হিসেবে এক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেও মূর্ত করে। তাই বেহুলা-পুরাণের শ্রুতি বাংলার ঘরে ঘরে, বাংলাদেশের কবির অন্তরে ও কলমে।

গ্রন্থপঞ্জি

অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৯৯)। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পঞ্চম মুদ্রণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

আল মাহমুদ (২০০৬)। কবিতাসমগ্র-১, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা

আসাদ চৌধুরী (২০০৮)। কবিতাসমগ্র (পরিমার্জিত সংস্করণ), অনন্যা, ঢাকা

আহমদ শরীফ (২০০৪)। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ওমর আলী (১৯৮৫)। ডাকছে সংসার, মুক্তধারা, ঢাকা

ওমর আলী (২০০২)। শ্রেষ্ঠ কবিতা, বইপত্র, ঢাকা

কাজী নাসির মামুন (২০০৬)। লখিন্দরের গান, লোক, ঢাকা

ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস (২০১১)। নির্বাচিত রচনা, শামসুদ্দিন চৌধুরী অনূদিত, বর্ণায়ন, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০)। কবিতা সংগ্রহ, জনান্তিক, ঢাকা

ক্ষেত্রগুপ্ত (২০০১)। প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত (২০০১)। মিথ-পুরাণের ভাঙ্গাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জীবনানন্দ দাশ (২০১৬)। প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, পঞ্চাশ মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

দীনেশচন্দ্র সেন (২০০৯)। বেহুলা, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা

বায়তুল্লাহ কাদেরী (২০১৭)। কাব্যসমগ্র, লেখা প্রকাশ, ঢাকা

বিজয়গুপ্ত (১৯৬২)। পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম.এ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। লোকপুরাণ জনসমাজ ও কথাশিল্প, নান্দনিক, ঢাকা

মুজিব ইরম (১৯৯৬)। মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১২)। বেহুলার শাড়ি, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিক (১৯৮৩)। খোলা কবিতা, ড্যাফোডিল প্রকাশনী, ঢাকা

রফিক আজাদ (২০০৭)। কবিতা সমগ্র, অনন্যা, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, একুশে পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৯২)। রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

সুধীরচন্দ্র সরকার (১৪০৪ বঙ্গাব্দ)। পৌরাণিক অভিধান, ষষ্ঠ সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯৭ ও ২০০১)। কবিতা সংগ্রহ-১ ও ২, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

হুমায়ুন কবির (২০১৫)। বাঙলার কাব্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Joseph campbell (1988), The Power of Myth, US.

Khandaker Ashraf Hossain (2012), On Behula's Raft, UPL, Dhaka.

International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore (1960), Vol-1: Copenhagen.

পত্র/পত্রিকা

আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পাদ] (২০১৮), *অমিত্রাক্ষর*, নারী দিবস সংখ্যা, ঢাকা
সচিত্র সন্ধানী (১৯৭৯), বিজয় দিবস সংখ্যা, ঢাকা